কানকুনে কি আসলে গরিবরা জিতেছে?

- অনন্য রায়হান

কানকুনে কনভেনশন সেন্টারের বাইরে যখন সম্মেলন ভেস্তে যাওয়ার খবর এলো তখন অনেকেই উৎসবে মেতে উঠেছেন। সেই উৎসবের ছোঁয়া কিছুটা সম্মেলন কেন্দ্রের ভেতরেও ছিল। তবে সম্মেলন কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে যাঁরা হতাশ ছিলেন, তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। সম্মেলন ভেঙে যাওয়ার পর সবাই যখন ঘরে ফিরে হিসাব কষতে বসেছেন, তখন মনে হচ্ছে 'খারাপ চুক্তির চেয়ে চুক্তি না হওয়াই ভালো' এই যুক্তির অনেকে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' এই যুক্তির দিকে ঘেঁষতে শুরু করেছেন। সম্মেলন শেষ হওয়ার দু'সপ্তাহ পার না হতেই এই সংরক্ষণবাদী মনোভাব কেন চাঙা হয়ে উঠছে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমি বিভিন্ন চুক্তির ধারাভিত্তিক আলোচনায় না গিয়ে প্রক্রিয়াগত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবো।

কেন সম্মেলন ভেঙে গেল?

সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা কিছুটা আচমকাই ছিল। 'সিঙ্গাপুর ইস্যু' নিয়ে যখন ৩০টি দেশের অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চলছিল, তখনই সম্মেলনের সভাপতি হঠাৎ করেই আলোচনা বন্ধের ঘোষণা দিলেন। যখন অনেকে আশা করছিলেন যে, আলোচনা মধ্যরাত পর্যন্ত ত' চলবেই, তা' প্রত্যুষ পর্যন্ত গড়াতে পারে, এমনকি সম্মেলন দোহার মতো আরও একদিন বাড়ানো হবে, তখন কোনও রকম বিস্তারিত ঘোষণাপত্র ছাড়া সম্মেলনের ইতি টানাতে অনেকেই বিস্ময় চেপে রাখতে পারেননি। কেন না নির্ধারিত সময় বিকেল চারটা বাজতে তখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি।

যে বিষয়টি এখনও রহস্যাবৃত তা হলো, কানকুনের আলোচনা কি কোনও সুনির্দিষ্ট ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভেঙে গেল? নাকি নিছক যথেষ্ট সময়ের অভাবে শেষ করে দেওয়া হলো? মেক্সিকোর বিদেশ ও বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী এবং সম্মেলনের সভাপতি দেরবেজ কিভাবে সিদ্ধান্তে আসলেন যে আলোচনার আর সুযোগ নেই?

শনিবার গভীর রাতে (রোববারের প্রথম প্রহরে, সেপ্টেম্বর, ১৪) সভাপতি দেরবেজ নয়টি দেশের প্রতিনিধিদলের প্রধানদের একটি বৈঠক ডাকেন, যা রাত ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চলে। আলোচনায় সিঙ্গাপুর ইস্যুতে সবক'টি দেশই তাদের পূর্বের অবস্থানে অনড় ছিল। পরে সকালে ৩০টি দেশের মন্ত্রীদের একটি বৈঠক আহবান করা হয়। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল, শুধু ওই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হবে, যেগুলোতে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে, যাতে করে ব্যবধান কমিয়ে আনার সুযোগ তৈরি করা যায়। দেরবেজ সিঙ্গাপুর ইস্যু নিয়ে আলোচনা শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। উন্নয়নশীল দেশগুলো সিঙ্গাপুর ইস্যুকে পর্যালোচনার পর্যায়ে রেখে দেওয়ার প্রস্তাব করলে দেরবেজ বারবার সিঙ্গাপুর ইস্যুসমূহের দু'টিতে (সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা এবং বাণিজ্য সহজীকরণ) আলোচনা শুরু করার ব্যাপারে রাজি হওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। তিনি বাকি দু'টি ইস্যুকে এজেন্ডা থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। প্যাসক্যাল ল্যামি এমনকি বিনিয়োগ ও প্রতিযোগিতা নীতির বিষয় দু'টি একেবারে ডবি-উটিওর আওতা বহির্ভূত করার প্রস্তাব দেন। এ রকম পরিস্থিতিতে অনেক দেশের প্রতিনিধি রাজধানীর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলে দেরবেজ আলোচনায় বিরতি দেন। বিরতির পরে আলোচনা শুরু হলে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের

প্রতিনিধি তাদের অপারগতার কথা জানান। তখন দেরবেজ বলেন, যেহেতু সিঙ্গাপুর ইস্যুতে সমঝোতার সম্ভাবনা নেই, সুতরাং পুরো প্যাকেজেও সমঝোতা সম্ভব নয়। তিনি তখন সম্মেলন ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

আপাতদৃষ্টিতে সিঙ্গাপুর ইস্যুকে সম্মেলন ভেঙে যাওয়ার কারণ মনে হলেও মূল কারণ কি তাই? জেনেভা থেকেই একটি ব্যাপার পরিষ্কার ছিল, যে সম্মেলনের আলোচনা মূলত আবর্তিত হবে কৃষিকে ঘিরে। বাস্তবেও সম্মেলনের প্রথম তিনদিন আলোচনা-বিতর্ক ছিল কৃষিকেন্দ্রিক। জি-২১-এর শক্তিশালী ও যৌক্তিক অবস্থান যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বেকায়দায় ফেলে দিচ্ছিল। সবচেয়ে সোজা-সাপ্টা শক্ত যুক্তি ছিল– তোমরা বিকৃতিমুক্ত বাণিজ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছো, অথচ সবচেয়ে বড় বিকৃতি যে কৃষি বাণিজ্যে (অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি, রফতানি ভর্তুকি ও উচ্চ শুল্কাহার), তার ব্যাপারে তোমরা রক্ষণশীল থেকে আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছ বাজার খুলে দিতে। এই নগ্ন ভণ্ডামি বন্ধ করতে হবে। কৃষি আলোচনার বেকায়দা অবস্থায় যদি সম্মেলন ভেঙে যেত, সেটি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য আরও বিপর্যয়কর হতে পারত। যে কারণে সম্মেলনের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর উদ্দেশ্য সিঙ্গাপুর ইস্যুতে উস্কানিমূলক টেক্সট কানকুনে প্রকাশিত খসড়া ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সেপ্টেম্বর, ১৩ দুপুর একটায় প্রকাশিত খসড়া ঘোষণাপত্রের কানকুন ভার্সন বোমা ফাটানোর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। একশ'রও বেশি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের প্রতিনিধিরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সম্মেলনের বাইরে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের ইচ্ছাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিকল্প টেক্সট উঠিয়ে সুস্পষ্টভাবে দু'টি সিঙ্গাপুর ইস্যুতে অনতিবিলম্বে, এবং বাকি দু'টিতে পরবর্তীকালে আলোচনা শুরুর প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও সিঙ্গাপুর ইস্যুর ব্যাপারে সুস্পষ্ট দোহা ম্যান্ডেট ছিল যে, যদি সিঙ্গাপুর ইস্যুতে আলোচনা শুরু হতেই হয়, তা হতে হবে সুস্পষ্ট মতৈক্যের (explicit consensus) ভিত্তিতে। আগের আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ট দেশ সিঙ্গাপুর ইস্যুর বিরোধিতা করলেও সংশোধিত ঘোষণাপত্রে এরকম টেক্সট নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথমত, কৃষি আলোচনার অচলাবস্থা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া, দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনমনীয় অবস্থানকে দোষারোপ করার সুযোগ সৃষ্টি করে আলোচনা ভেঙে দেওয়া এবং 'ডবি-উটিওর সংস্কার প্রয়োজন'– এই ধুয়ো তোলা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, উন্নয়নশীল ও গরিব দেশগুলো ডবি-উটিওর সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে অগণতান্ত্রিক বলে আসলেও উন্নত দেশগুলো এই পদ্ধতির সাফাই গেয়ে এসেছে। কেন না, জোরজবরদস্তি, গোপন আলোচনা এবং দ্বিপাক্ষিকভাবে 'হাত মোচড়ানো'র পদ্ধতি ব্যবহার করে এ পর্যন্ত উদ্দেশ্য হাসিল করা গেছে। এবারে এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর হোমওয়ার্ক আগের তুলনায় যথেষ্ট ভালো ছিল। সুতরাং 'divide and rule' পদ্ধতি কাজ করবে না দেখে আলোচনা ভেঙে দেওয়াই তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। প্যাসক্যাল লামি যখন আলোচনা ভেঙে যাওয়ার অব্যবহিত পরে আয়োজিত মিডিয়া ব্রিফিং-এ ডবি-উটিওকে 'মধ্যযুগীয় সংগঠন' বলে নিন্দা জানিয়ে এর সংস্কারের আহবান জানান, তখন মনে হয় আলোচনা ভেঙে যাওয়ার মূল কারণ নিহিত এখানে। অর্থাৎ ডবি-উটিওর সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার গলদ'ই আলোচনা ভেঙে যাওয়ার জন্য দায়ী। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর কাছে এই গলদের ব্যাখ্যা একরকম। আর উন্নতদেশসমূহের

কাছে এই কারণের ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্নরকম ও ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে আলোচনার শেষাংশে আবার ফিরে আসবো।

জেনেভা কি পারবে, কানকুন যা পারেনি?

সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত ঘোষণায় সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে অনুরোধ করা হয়েছে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠকের মাধ্যমে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে, যেন ২০০৪ সালের মধ্যে দোহা 'উন্নয়ন রাউন্ড' আলোচনা শেষ করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিকে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপকভিত্তিক বিকল্প ম্যান্ডেট নিয়ে আসতে হবে, যেন সমঝোতায় আসতে রাজধানীর অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে না হয়। সেরকম ম্যান্ডেট যে কোন সরকারের পক্ষে দেওয়া কঠিন। তাছাড়া, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে ঝুঁকি নিয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের সাহস রাখেন, আমলাদের পক্ষে সঙ্গত কারণেই তা' সম্ভব নয়। সুতরাং জেনেভায় সাফল্য লাভ আরও দুরূহ হতে পারে। এখানে আরেকটি জিনিস অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তা হলো, কানকুনে প্রকাশিত খসড়া ঘোষণাপত্রের ভাগ্যে কী ঘটেছে (ঘোষণাটি বর্তমানে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যেটি আছে তাতে পাদটীকাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে, কার এখতিয়ারে তা অবশ্য প্রশ্ন সাপেক্ষ)। ১৫ ডিসেম্বরের সময়সীমা কি শুধু অসম্পূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শেষ করার জন্য, নাকি ২৪ আগস্টের খসড়া থেকে আলোচনা পুনরায় শুরু হবে? অথবা, এমনটি ঘটবে, প্রতিটি ইস্যুর জন্য পৃথক পৃথক কমিটিতে আলোচনা শুরু হবে। সেক্ষেত্রে যে সব বিষয় সব আলোচনাতেই স্থান পাবে (cross-cutting issue), সেগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কিভাবে গৃহীত হবে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

ব্যারিকেডের উভয় পাশেই যখন 'ডবি-উটিও'র সংস্কারের চিন্তাভাবনা সামনে চলে এসেছে, তখন দরকষাকষির চুলচেরা এবং স্নায়ুক্ষয়ী আলোচনায় যাওয়ার আগে অনেকেই চাইবেন সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে আগে আলোচনা করতে। সুতরাং ১৫ ডিসেম্বরও আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট সময় বলে মনে হচ্ছে না।

দোহা উন্নয়ন রাউন্ড কি ২০০৪ সালে শেষ হবে?

কৃষি, সেবা, মেধাস্বত্ব আইন, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা যে পর্যায়ে রয়েছে, তাতে করে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দোহা উন্নয়ন রাউন্ডের সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। পুনঃনির্ধারিত সময় কী হবে, এ মুহূর্তে ধারণা করা মুশকিল, তবে তা ২০০৫ সালের হংকং সম্মেলন পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে। তবে সময় পুনঃনির্ধারণের প্রক্রিয়া বৈধ হবে কিনা, তা' নিয়ে সংশয় রয়েছে। অবশ্য বৈধতার ব্যাপারগুলো ডবি-উটিও সেক্রেটারিয়েট অনেক সময়ই তোয়াক্কা করে না।

ডবি-উটিও কি চেয়ারড্রিভেন?

সিঙ্গাপুর থেকে কানকুন– ক্রমাগতভাবে 'গ্রিনরুম' পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ, সম্মেলনের আলোচনায় 'বর্ণপ্রথা' চালু (কেউ কেউ আলোচনায় ডাক পায়, কেউ পায় না), অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ প্রকৃতপক্ষেই সংস্থাটির পরিচালনা পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এছাড়া সভাপতির 'নিজ দায়িত্বে' খসড়া তৈরির প্রথা ধীরে ধীরে সংগঠনের অগণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মুক্ত বাণিজ্যে আস্থার কাঁচা ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। অনেকেই কানকুনে প্রকাশিত খসড়া ঘোষণাপত্র পড়ে মন্তব্য করেছেন, ডবি-উটিও 'মেম্বারড্রিভেন

থেকে চেয়ার ড্রিভেন' সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছে, যা বছরের পর বছর, মাসের পর মাস স্নায়ুক্ষয়ী আলোচনা ও সমঝোতাকে অর্থহীন করে দিয়েছে।

কানকুন সম্মেলন ব্যতিক্রমধর্মী

এই প্রথম সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটলো নির্ধারিত সময়ের আগে। পূর্বনির্ধারিত গ্র্যান্ডহলের পরিবর্তে ছোট কক্ষে সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত সমাপনী অধিবেশন যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অনেক সরকারি প্রতিনিধিকেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের কর্মীদের কথা বলাই বাহুল্য। নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী অনেকের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এবারের সম্মেলন ভেঙে গেছে আলোচনা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সিয়াটলের মতো বাইরের বিক্ষোভকারীদের বিক্ষোভের তীব্রতার কারণে নয়। দোহাতে সম্মেলনের মেয়াদ একদিন বৃদ্ধি করাতে পূর্বনির্ধারিত ফিরতি বিমান ধরতে অনেক দেশের প্রতিনিধি শেষদিন উপস্থিত ছিলেন না, অনেকটা চাপের মুখে একটি সমঝোতামূলক দোহা ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এবারে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি ফ্লাইট বাতিল করে শেষ দেখে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। যেন তেন প্রকারে একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণে তারা এবার আর রাজি হননি। উন্নয়নশীল ও গরিব দেশের প্রতিনিধিদের মাটি কামড়ে থাকা মানসিকতার কারণে সমঝোতার আশা ছেড়ে দিয়ে সম্মেলন ভেঙে দেন সভাপতি। নব্বইটি দেশের মৌলিক বিষয়সমূহে ঐক্য ছিল অভূতপূর্ব। এবারের আলোচনা অনেক দেশের যুক্তিপূর্ণ বিস্তারিত উপস্থাপনা উন্নতদেশের প্রতিনিধিবৃন্দের বিরক্তির কারণ ছিল। এবারের সম্মেলনেই প্রমাণিত হয়েছে *Critical Engagement* এর শক্তি।

গরীবরা কি আসলে জিতেছে?

সম্মেলনের ভেঙে যাওয়ার কারণ আমি বলতে চেয়েছি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র সব দেশই মনে করে যে, ডবি-উটিওর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আদিম (primitive), সুতরাং আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসা অসম্ভব। দরিদ্র দেশগুলো সম্মেলন ভেঙে যাওয়াকে সাফল্য মনে করতেই পারে, কেন না এরকম পরিস্থিতি, যেখানে উন্নত দেশগুলো গরিব দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের সামনে পিছু হটেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, বিশেষত স্নায়ুযুদ্ধোত্তর সময়ে খুব কমই ঘটেছে। এখন সুযোগ তৈরি হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে সুসভ্য, সুশৃঙ্খল স্বচ্ছ ও সমতামুখী সংস্থায় রূপান্তরিত করার।

অন্যদিকে, উন্নত দেশগুলো 'খারাপ চুক্তির চেয়ে কোন চুক্তি নয়' এই যুক্তি মেনেছে (যদিও তা ছিল চপেটাঘাতের মতো), কেন না, এখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে 'মধ্যযুগীয়' বলে বিশ্ব ব্যাংক বা আইএমএফ-এর মতো করে সংস্কারের একটা চেষ্টা নেওয়ার সুযোগ তৈরি হলো। তাছাড়া, উন্নত দেশগুলো উপলব্ধি করেছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঐক্য 'একদেশ-এক ভোট' পদ্ধতিতে বিপজ্জনক, সুতরাং সংস্থার অধীনে বাণিজ্য আলোচনাকে ধীর করে দিয়ে আরও বেশি দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নশীল ও গরিব দেশগুলোকে বশীভূত করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। আলোচনা ভেঙে যাওয়ার ভয়াবহ দিক হচ্ছে এটিই।

এসব কারণেই সম্মেলন ভেঙে যাওয়ার পরের আনন্দ-উত্তেজনাকে শঙ্কায় গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। আগামী দিনগুলিতে জেনেভায় আলোচনা কোন দিকে মোড় নেয়, তার ওপরেই নির্ভর

করছে, গরীবদেশের স্বার্থের প্রতি ধনীদেশগুলোর 'কপট আন্তরিকতা' যা দোহা ঘোষণাপত্রে স্থান পেয়েছিল, তা 'সত্যিকারের আন্তরিকতায়' রূপান্তরিত হবে কিনা। গরীব দেশগুলো জিতেছে, এখনই বলা যাবে না, তা নির্ভর করছে, তারা যে ঐক্য কানকুনে গড়ে তুলেছিল, তা ধরে রাখতে পারবে কিনা তার ওপর।

করণীয় কী?

কানকুনই সবকিছুর শেষ নয়। তবে উন্নতদেশগুলো শুরুতে 'নো বে-ম গেম' বললেও এখন নাম ধরে বিভিন্ন দেশকে সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ি করেছে। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির অবসান না ঘটে বরং আগামী দিনগুলোতে উত্তেজনা আরও বাড়বে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করার কথা বলেছেন। এই প্রবণতা অন্য অনেক দেশেই প্রাধান্য পাবে। বাংলাদেশকে কানকুন সম্মেলনের সভাপতি করে ঢাকা ঘোষণার অনেকগুলো বিষয়ে 'ছাড় দিয়ে' অনুন্নত দেশগুলোর ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা হয়েছে। সম্মেলন ভেঙে যাওয়াতে অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই। তবে ঐক্য ভাঙার চেষ্টা আরও বাড়বে। একটি বিষয়ে উপলব্ধি প্রয়োজন, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় দীর্ঘমেয়াদে সুফল ঘরে তুলতে অনেক সময় নিজেদের জন্য আপাতত কম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেও জোরালো ভূমিকা রাখা প্রয়োজন হয়। আফ্রিকার 'তুলা ইস্যু' সেরকম একটি বিষয়। বাংলাদেশ তার কৌশল নির্ধারণে আরও সর্তক হলে ভবিষ্যতে পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সমর্থনের ব্যাপারে যত্নবান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এবারের সম্মেলন প্রমাণ করেছে, আলোচনায় দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্মেলনে মনে হয়েছে, জেনেভা ও ঢাকার মধ্যে কাজের সম্পর্ক আরও নিবিড় হওয়া প্রয়োজন। অনুন্নত দেশগুলোর নেতা হিসেবে বাংলাদেশের মেয়াদ সম্মেলনের পরে শেষ হয়ে গেলেও গ্রুপের বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। গরীবদের জয় আনতে বাংলাদেশ যথাযোগ্য ভূমিকা রাখবে, এটিই আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা।

ড. অনন্য রায়হানঃ সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর রিসার্চ ফেলো। তিনি সিপিডি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে কানকুন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।